আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী

অবিভক্ত বাংলায় রেনেসাঁ ঠিক কোন বছর থেকে শুরু হয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখ থেকে এই পুনর্জাগরণকে চিহ্নিত করতে পারি। এটাই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন। শুধু তাই নয়, এর ঠিক তিন বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দু'জনে মিলে বাংলার বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তাই বোধ হয় বাংলার রেনেসাঁ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এটা পালাবদলের একটা বিশেষ মুহূর্ত। জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন একুশ এবং যে বছর তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন সেই বছর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুদূর জার্মানির উলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন এলবার্ট আইনস্টাইন। আর ঠিক সেই বছরই মহাপ্রয়াণ ঘটে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্বের জন্মদাতা জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের। ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেই জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবীর বিজ্ঞানীসভায় স্থায়ী আসন লাভ করেন এবং আইনস্টাইনও ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি নিয়ে গভীর আলোচনার মাধ্যমেই দেশকাল সম্বন্ধে মানুষের ধারণা চিরদিনের জন্য বদলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মনে রাখা দরকার যে, ঐ একই বছর দস্তয়ভস্কি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ব্রাদার কারামাজভ' প্রকাশ করেন এবং জার্মানির ভার্নার ফন সিমেন্স বার্লিনের বাণিজ্য প্রদর্শনীর জন্য প্রথম বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেন। সুতরাং ইউরোপ সেদিন দ্রুত বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক আবহে প্রবেশ করছিল— যার ছোঁয়া বাংলায় এসেছিল অনেক ধীরে। যাঁরা সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে নিঃশঙ্কোচে এগিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রথম।

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ তখনকার বাংলায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনটি আন্দোলনের স্রোতধারা পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল। এর একটা ছিল মূলত হিন্দু ধর্মীয়— যার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এটাকে হিন্দু ধর্মীয় বিপ্লবও বলা চলে, কেননা শতাব্দীর কুসংস্কার আর গোঁড়ামির ফলে হিন্দুসমাজে যে আধ্যাত্মিক স্থবিরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় তার মধ্যে আবার প্রাণের স্পন্দন আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তাঁর ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনও আসলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তবু তিনি তাঁর পুত্রকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন একটি সাধারণ বাংলা স্কুলে— যেখানে, তাঁর ভাষায়, 'দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বামদিকে ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল।' মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং নিম্নবিত্ত মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূর্ববাংলার শিক্ষাজীবন এভাবেই শুরু হয়েছিল— যার উজ্জ্বল ফসল জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরো অনেকে।

সেদিনকার বাংরায় দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল ঐ শিক্ষা প্রসারের— যার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যের আঙ্গিকে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের গোড়াপত্তন করলেন। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল হিন্দু পণ্ডিতের সংস্কৃত-সমৃদ্ধ বাক্যজালের অক্টোপাশ বন্ধনে মুমূর্ষু। বঙ্কিমচন্দ্র সেই নাগপাশ থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিলেন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির যাদু দিয়ে। কিন্তু একই সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের ইতিহাস থেকে কিছু শাসক মুসলিম চরিত্র নিয়ে এবং বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের উপস্থাপিত করে তিনি বপন করে গেলেন চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িকতার বীজ। রাজা রামমোহন রায় যে উদার ধর্মীয় আলোকে বাংলার সমাজকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তা বঙ্কিমের মুসলিম নামধারী কিছু চরিত্র চিত্রণে বহুদিনের জন্য পশ্চাদমুখী হয়ে গেল।

তৃতীয় আর একটি আন্দোলন এ সময় বাংলায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল যাকে বলা যায় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলন। এটা যে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, তা নয়। বলা যায় এটা ছিল বাঙালির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রথম প্রয়াস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দেয়া হাজারো অপমানের বিরুদ্ধে বাংলার শিক্ষিত সমাজই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, এটা ছিল অসম্মানের বিরুদ্ধে অধীরতার কণ্ঠ— যে অসম্মান আমাদের ওপর সব সময় চাপিয়ে দিচ্ছিল এমন এক জাতি যারা প্রাচ্যদেশীয় নয়। বিশেষকরে এই সময়ে এই জাতির অভ্যাস ছিল মানুষের পৃথিবীকে সরাসরি ভাল এবং খারাপ এই দু'ভাগে ভাগ করা— যার ভিত্তি হল কোন গোলার্ধে তার জন্ম। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত তিনটি অন্দোলনের বাতাবরণে বেড়ে উঠেছিলেন। সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এ ধারণা অবশ্যই তখন ছিল না। নিভৃত পল্লী বিক্রমপুরে পাঠশালায় পাঠরত এক কিশোরের মনে বিজ্ঞান নিয়ে সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়নি। কিন্তু তবু বিজ্ঞানের আকর্ষণ তিনি অল্প বয়সেই অনুভব করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তিনি এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি হলেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে— যেখানে সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বেলজীয় পাদ্রি ফাদার লাফোঁ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখানোর তাঁর প্রচেষ্টাই যে বাঙালি তরুণদের বিজ্ঞানের দিকে প্রথম আকৃষ্ট করে তোলে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরের বছর তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য।

স্বাস্থ্যগত কারণে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্র শেখা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে উৎসাহ দিলেন বিজ্ঞান পড়ার জন্য। তাই জগদীশচন্দ্র চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন বিজ্ঞান শেখার জন্য। একশ' বছর পরে আজ কোন ছাত্র অর্থকরী চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়ে বিজ্ঞান পড়ছেন একথা চিন্তাই করা যায় না, কিন্তু সেদিন এটা সম্ভব ছিল। কেমব্রিজ থেকে জগদীশচন্দ্র বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। বার বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাকে ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করে সম্মানিত করে।

দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর জগদীশচন্দ্র বসু নিযুক্ত হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক হিসেবে। সেদিন থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহনের দিনটি পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র এবং আরো অনেকে— যাঁরা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অক্ষয় কীর্তি রেখে বাংলার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

প্রথমদিকে বসুর বেতন ছিল ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ। একথা জানার পর বসু বেতন নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তিনি শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন, কেননা শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাছে একটা বিশেষ সম্মান। এক বছরের মধ্যেই সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং বকেয়াসহ পুরো বেতন দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

বিদেশী শাসকদের এই ধরনের আচরণ সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা দ্রুত মৌলিক গবেষণার দিকে আকৃষ্ট হল। বিজ্ঞান গবেষণায় সেদিন বোধ হয় জার্মানি সবার শীর্ষে ছিল। জগদীশচন্দ্র যে বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তার তিন বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় বার্লিনে বিখ্যাত গবেষণাগার রাষ্ট্রীয় ভৌত-প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র। এখানেই পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছিলে। ঐ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎস পরীক্ষাগারে প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করেন যা জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঠিক বাইশ বছর আগে তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অসাধারণত্ব বোধ হয় এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, হার্ৎসের আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই সুদূর কলকাতায় বসে তিনি ঐ একই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং দ্রুত অভাবিত সাফল্য লাভ করেন। মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞান গবেষণার কোন ঐতিহ্য তখন ভারতে ছিল না। বিজ্ঞান গবেষণাগার বলতেও কলকাতায় তেমন কিছু ছিল না— যদিও কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার বহুদিন ধরে একটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন। তিনি লিখছেন, 'বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে প্রযুক্তিশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক ভদ্রলোকরা বৃথা শক্তি অপচয় করছেন।' আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একশ' বছর পরেও বর্তমান বাংলাদেশে এমন অনেকে আছেন যাঁরা বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই ফলিত বিজ্ঞানের ওপর অহেতুক জোর দিয়ে ধূম্রজালের সৃষ্টি করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কয়েক দশক পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্য সবচেয়ে উত্তম বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থাও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুযোগ-সুবিধার ধারেকাছেও পৌঁছত না। গত একশ' বছরে পার্থক্যটা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞান প্রশাসকরা কোন দিনই একাডেমিক গবেষণার এই মৌলিক চরিত্র অনুধাবন করতে পারেনি যে, গবেষণায় তাত্ত্বিক এবং ফলিত উভয় কর্মকাণ্ডই সমান ভূমিকা পালন করে।

১৮৭০ সালের দিকে কলকাতার তিনটি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশে শিক্ষাদোনের ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হল মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের চিকিৎসাবিদ্যায় টেকনিশিয়ান তৈরি করা। বহুদিন ধরে ব্রিটিশ-ভারতে এই মেডিকেল কলেজটি ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে বিজ্ঞান পরীক্ষণের কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজ যেখানে জগদীশচন্দ্র বসু সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন।

তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানটির কথা বলতেই হয় তা হল জেসুইট পাদ্রিদের পরিচালিত কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাদানের জন্য এই কলেজের যে সুনাম ছিল তার মূলে ছিলেন ফাদার অয়জিন লাফোঁ। এই বেলজীয় পদার্থবিজ্ঞানী চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজে শিক্ষাদান করেছেন এবং বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষায় পথিকৃৎ হিসেবে নিঃসন্দেহে তাঁকেই চিহ্নিত করা চলে। ফাদার লাফোঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং ডেমোনস্ট্রেশন কলকাতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'প্রিয় জগদীশ, আমি একটি উন্মুক্ত বক্তৃতা দিতে চাই যা হবে বেতার টেলিগ্রাফির ওপর। এই সুযোগে মার্কনির ওপর তোমার অগ্রাধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ নিতে চাই।'

ফাদার লাফোঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি ১৮৬৮ সালে ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন প্রকাশ করা শুরু করেন। তিন বছর পরে এই পত্রিকাতে তিনি 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এমন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যেখানে তরুণ ভারতীয়রা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে পরবর্তী সাতাশ বছর তিনি এই এসোসিয়েশনের প্রবৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' ছিল আর একটি কেন্দ্র যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান এবং সত্যিকারের স্বনির্ভরতার মধ্যে যে একটা গভীর সংযোগ রয়েছে তা প্রথম স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে গভীর অনুরাগী হয়েও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের স্থবিরতাই হল ভারতের দাসত্বের প্রধান কারণ। জাতীয় পুনর্জাগরণের অবশ্যম্ভাবী অংশ হবে আধুনিক বিজ্ঞান— এই বিশ্বাসে তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন 'কলকাতা বিদ্যালয়' যেখানে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। সাত বছর পরে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড এমহার্স্টের কাছে লিখেছেন, 'স্থানীয় জনগণের উন্নতি যেহেতু সরকারের কাম্য তাই সরকারের উচিত একটা উদারনৈতিক এবং আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা যার মধ্যে থাকবে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান'।

আর একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল, যার পেছনে ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জির দূরদৃষ্টি এবং কর্মদক্ষতা। এককালের গণিতবিদ আশু মুখার্জি চাঁদা তুলে সৃষ্টি করলেন 'বিজ্ঞান কলেজ'— যা ছিল ভারতের প্রথম পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি জনসাধারণের অনুদানের মাধ্যমে যে প্রথম প্রফেসর পদের চেয়ার সৃষ্টি করেন—পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে পালিত অধ্যাপকের চেয়ার— তারই প্রথম অধিকারী ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তুলনা করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৫ বছর পরেও আজ পর্যন্ত কোন পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠান ঢাকায় স্থাপিত হয়নি। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজই সৃষ্টি করেছে ভারতীয় বিজ্ঞানের পাঁচজন অবিস্মরণীয় নাম— জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা।

এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি বেতারে বার্তা প্রেরণ করার এক ঘরোয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। আসলে এই দশ বছর বসু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ উৎপাদন, গ্রাহকযন্ত্রে ধারণ এবং তার বিকিরণ গুণাবলীর পরীক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে হাইনরিখ হার্ৎস যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রথম সৃষ্টি করেন তার সাত বছরের মধ্যে সুদূর কলকাতায় বসে এ ধরনের পরীক্ষণে সম্পূর্ণ একাকী কাজ করে যাওয়া কম সাহসিকতা এবং মনোবলের পরিচয় দেয় না। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশেষকরে ৫ মিলিমিটার থেকে ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করা। এই সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করার কাজে জগদশিচন্দ্র বসু নিঃসন্দেহে প্রথম এবং বিজ্ঞানীসমাজ আজ তাঁকে অকুণ্ঠভাবে এই সম্মান দিয়ে থাকে। তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছিল দ্বৈত প্রতিসরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সমবর্তনের ওপর পরীক্ষা। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের একটি সংখ্যায়। এক বছর পরে এই গবেষণাকে আরো প্রসারিত করে যে ফল পেয়েছিলেন তা তিনি লর্ড র‍্যালের মাধ্যমে রয়াল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। পরবর্তী কয়েক বছর বসু অর্ধপরিবাহী বস্তুর এবং আলোক-পরিবাহকতার ওপর বিভিন্ন গবেষণা করেন।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার টাউন হলে একটি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি সর্বপ্রথম কঠিন দেয়ালের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের তারহীন প্রেরণ প্রমান করেন। এর ফলেই দ্রুত তাঁর নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরই ইংল্যান্ডের ইলেকট্রিশিয়ান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, বর্তমান সময়ে বেতারে বার্তা প্রেরণ করার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত যন্ত্র তাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসুর ক্রমবর্ধমান খ্যাতির ফলে বাংলা সরকার নয় মাসের জন্য তাঁকে ইউরোপ ভ্রমণে পাঠান। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র বসু রয়াল ইন্সটিটিউশনের এক সভায় বেতারে বার্তা প্রেরণ প্রকাশ্যে দেখান। সভায় উপস্থিত ছিলেন লর্ড র‍্যালে এবং আরো অনেকে। সুতরাং মার্কনির এক বছর আগেই যে তিনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন একথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ সম্মান তিনি পাননি কিন্তু যা পেয়েছিলেন তার মূল্যও কম নয়। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে লেখেন,

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে-
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছো তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পদার্থবিজ্ঞান যখন একদিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং অন্যদিকে প্ল্যাংক-আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকে মোড় ফিরছে তখন অজ্ঞাত কারণে জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা শুরু করেন সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয়ে। সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিয়ে তিনি জৈব এবং অজৈব পদার্থে বিকিরণ-শোষণ প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা শুরু করলেন। এর পরের তিরিশ বছর ধরে তাঁর গবেষণা ছিল মূলত তুলনামূলক শরীরবিদ্যার ওপর, বিশেষকরে উদ্ভিদ শরীরবিদ্যার ওপর। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফল নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন যার নাম 'জীব এবং জড়ের সাড়া' (Response in the Living and Non-Living)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, উদ্ভিদও বিদ্যুৎ প্রবাহের উত্তেজনা অনুভব করে এবং সাড়া দিয়ে থাকে। এর আগে ১৯০১ সালের ১০ মে তিনি রয়াল ইন্সাটিটিউশনের শুক্রবারের সান্ধ্য অধিবেশনে এ ব্যাপারে বক্তৃতা দেন। ৬ জুন তিনি রয়াল সোসাইটির সভায় 'অজৈব বস্তুর বৈদ্যুতিক সাড়া' (Electric Response of Inorganic Substances)-এর ওপর বক্তৃতা দেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ তিনি লিনিয়ান সমিতিতে (Linnean Society) জীব-বৈজ্ঞানকি প্রতিষ্ঠানের এক সভায় 'যান্ত্রিক উত্তেজনার অধীনে সাধারণ উদ্ভিদে বৈদ্যুতিক সাড়া' (Electric Response In ordinary Plants under Mechanical Stimulus)—এই বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন। জগদীশচন্দ্র বসু যেসব উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তাঁর উক্ত পুস্তকে আছে, যেমন—

শিকড়— গাজর, মুলা
কাণ্ড— গাজর, মুলা
কাণ্ড— জেরানিয়াম ফুল, দ্রাক্ষালতা
পত্রবৃন্ত— বাদাম, শালগম, ফুলকপি, শাক, ইউকারিস লিলি
পুষ্পবৃন্ত— এরাম লিলি
ফল— বেগুন

এসবের বৈদ্যুতিক সাড়া মাপার জন্য তিনি স্বয়ং যেসব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন সেগুলির কর্মক্ষমতা দেখলে এখনও প্রায় একশ' বছর পরেও আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। বিক্রমপুরের গ্রামের সেই মেধাবী ছেলেটির যন্ত্রপাতি তৈরি করার হাত যে অসাধারণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উদ্ভিদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায়— সুতরাং জীবনের সাড়া বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেমনভাবে দেখা যায় তা শুধু অজৈবের মধ্যে সাড়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে কোন রহস্য বা খেয়ালীপনা নেই যেমন একটা অযান্ত্রিক প্রাণশক্তি যা বস্তুর জগতে যেসব ভৌত আইন সক্রিয় তার বিপরীতে বা বিরুদ্ধে কাজ করে। আমরা দেখেছি যে, সাড়া সংক্রান্ত প্রতিভাসগুলির জন্য প্রাণশক্তির অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এগুলি ভৌত রাসায়নিক প্রতিভাস যা অন্য যে কোন অজৈব অঞ্চলের মতোই ভৌত অনুসন্ধানের মাধ্যমে বোঝা যায়।

প্রকৃতিকে বোঝার জন্য ভৌত আইনই যে যথেষ্ট, এর মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার নেই, প্রেরিত-জ্ঞানের যে কোন অবকাশ নেই একথা এমনি স্পষ্টভাবে জগদীশচন্দ্র

বসুর আগে বা পরে কেউ বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। দুঃখের ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশে আজ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের নামে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ— যাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও রয়েছেন— তাঁরা ভৌত আইনই যথেষ্ট, একথা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না।

দৃঢ়চেতা জগদীশচন্দ্র বসু কাউকে খুশি করার জন্য উদ্ভিদে প্রাণশক্তি বা Vital Force-এর প্রায়োজন মনে করেননি এটাই বাঙালির বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

বাঙালি সংস্কৃতি— বিজ্ঞান যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসুর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের একটি দিক হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তিরিশ বছরের বন্ধুত্ব। জগদীশচন্দ্রের ওপর তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় পরিস্ফুট। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইয়রেজিতে অনুবাদের প্রেরণাও এসেছিল জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে যে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন তার পেছনেও জগদীশচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণা সুস্পষ্ট। জগদীশচন্দ্র বসু নিজেও কবি ছিলেন এবং তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভাগরথীর উৎস সন্ধানে' স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য ছিল। সেই প্রবন্ধটির ভাষার ঝঙ্কার আজও আমাদের কানে বাজে, 'কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্কর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম্ররাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে।'

সত্যেন বসু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন, 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যাঁরা এই মহান শিক্ষকের পদতলে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন আমি তাঁদের একজন। তখনকার তীব্র আনন্দের উত্তেজনা এখনও আমার অনুভবে আসে, যখন মনে হয় তিনি কি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর ক্লাসে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে তাঁর অসাধারণ আবিষ্কারগুলির কথা বলতেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল বিজ্ঞানে নিষ্ঠার এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আমাদের সময়কার অনেক ছাত্র স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানকে তাঁদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন এধরণের গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এই ঘটনার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল বাংলায় গবেষণার মহান পথিকৃৎদের অনুপ্রেরণাদায়ী উদাহরণ— স্যার জে.সি. ঘোষ এবং স্যার পি.সি. রায়। তাঁদের স্মৃতি চিরজীবী হোক এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রজন্মকে অব্যাহত অনুপ্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করুক।'

বাঙালি রেনেসাঁর অন্যতম স্রষ্টা বাঙালি বিজ্ঞান-সংস্কৃতির অন্যতম জনক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এই উপমহাদেশের প্রথম সার্থক বিজ্ঞানী। তিনি বিক্রমপুরের সন্তান এটাই আমাদের আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি।

বাংলাইন্টারনেট.কম